মানবাধিকার

বর্তমানে মানবাধিকার একটি বহু চর্চিত বিষয়, 'মানবাধিকার' ধারণাটি একটি ব্যাপক ধারণা। প্রত্যেক মানুষের একজন বিশ্বনাগরিক হিসেবে কিছু কিছু সুবিধাভোগের অধিকার আছে যা কোন রাষ্ট্র অস্বীকার করতে পারে না। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মানবাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মানবাধিকার ধারণাটির উৎস:

'মানবাধিকার' এর ধারণা প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই পশ্চিমি সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত পাশ্চাত্য তত্ত্ব ও চিন্তার মধ্যে নিহিত।

ব্রিটেনে ১২১৫ সালের মহাসনদ (The Magna Carta, 1215), ১৬২৮ সালের দ্য পিটিশন অব রাইটস এবং ১৬৮৯ সালের বিল অব রাইটস নাগরিক অধিকার রক্ষার ইতিহাসে মাইলফলক নামে পরিচিত। মহাসনদের মাধ্যমে রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সামন্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছিল, সাধারণ মানুষের অধিকার স্বীকৃতি লাভ না করলেও ইংরেজ জাতির স্বাধীনতার ইতিহাসে মহাসনদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃত, ব্রিটেনে পুঁজিপতিদের অধিকারের বিস্তারের ক্ষেত্রে ১৬২৮ সালের 'দ্য পিটিশন অব রাইটস' একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের সংগ্রাম বুর্জোয়া যুগের সূচনা করে এবং তাদের আন্দোলন শুরু হয়। ১৬২৮ সালে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের পক্ষ থেকে রাজা প্রথম চার্লস-এর কাছে অধিকার সংক্রান্ত এক আবেদন পত্র পেশ করা হয়। সেই দাবিপত্রটি (The Petition of Rights, 1628' নামে পরিচিত। সেই আবেদনপত্র অনুসারে পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়া করধার্য করতে পারবেন না, রাজার শান্তির সময়েও বিনা আদালতে কোন ব্যক্তিকে বন্দি করা এবং সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে এই আবেদনপত্রে দাবি রাখা হয়েছিল। রাজা প্রথম চার্লসও দাবি স্বীকার করতে বাধ্য হন। পার্লামেন্টের ও রাজার বিরুদ্ধে বিরোধের অবসান হয় ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লব এর মাধ্যমে। এই সময় পার্লামেন্ট তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়, এই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট ১৬৮৯ সালেই ঐতিহাসিক 'অধিকারের বিল' প্রবর্তন করে, এই আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতি[illegible] হয়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে রাজার স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 'মানবাধিকারের' ধারণাটি গড়ে উঠতে পেরেছে ব্রিটেনের এই 'অধিকার'

নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অনেক মানবাধিকারের ইতিহাসের উৎস খুঁজে পাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকারের প্রথম ঘোষণা হল ভার্জিনিয়ার অধিকার (The Verginiam Declaration of Rights, 1776)-এর ঘোষণা। এই ঘোষণাটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক স্বাধীনতার ভিত্তি বলা হয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল সংবিধান রচনা হওয়ার সময়ে মৌলিক অধিকার সেখানে সুযোগ পায় নি। এই কারণে অনেকগুলি অঙ্গরাজ্য তা অনুমোদন করে নি। তাই সংবিধান চালু হওয়ার অব্যবহিত পরেই ১৭৯১ সালে প্রথম দশটি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মার্কিন নাগরিকদের এই অধিকারগুলির ঘোষণাপত্রটিকে অধিকারের সনদ (The American Bill of Rights) বলা হয়। ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হলে আইনের যথাবিহিত পদ্ধতিতে বিচার পাওয়ার অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রভৃতি মার্কিন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৭৮৯ সালের ২৬ আগস্ট মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র-এ ফরাসি নাগরিকদের কতকগুলি অধিকার প্রদান করার কথা বলা হয়। এই অধিকারগুলি হল স্বাধীনতার অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, অত্যাচার প্রতিরোধ করার অধিকার ইত্যাদি। এ ঘোষণাপত্রে এই অধিকারগুলিকে স্বাভাবিক অধিকার বলে চিহ্নিত করা ~~হয়~~ হয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রায় সমকালীন সময়ে মেক্সিকোর সংবিধান, জার্মানির সংবিধান, স্পেনের সংবিধান প্রভৃতি অধিকারগুলিকে তাদের কাছে লিপিবদ্ধ করে। এই অধিকারগুলির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে উক্ত ইতিহাসে এই দলিলগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক জাঁ জ্যাক রুশো (1712–1778) মানবাধিকারের তত্ত্বের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট নাম। সমকালীন ফ্রান্সে অপশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফরাসি জনগণ প্রতিবাদে মুখর হন। এই প্রতিবাদের পিছনে রুশোর তত্ত্বগত সমর্থন যুগিয়েছিলেন। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব সংঘটনে রুশোর তাত্ত্বিক অবদান ছিল অনস্বীকার্য। কার্ল মার্কস ১৮৪৩ সালে তার রচিত 'ইহুদি প্রশ্ন' নামক প্রবন্ধে অধিকারের প্রচলিত ধারণাটির সমালোচনা করেছিলেন।

মানবাধিকারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অতীত — প্রাচীন যুগে, বর্তমান যুগে, সমসাময়িক কালে

প্রাচীন ভারতে একান্ত নিজস্ব মূল্যবোধ ও তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মানবাধিকার অবশ্যই একটি পৃথক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে অধিকার রক্ষার মূল নির্ধারক ছিল যুদ্ধ। মনুস্মৃতি (খ্রিস্টপূর্ব 200 – খ্রিস্টাব্দ 200), মহাভারত (খ্রিস্টপূর্ব 1000), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (খ্রিস্টপূর্ব 300) ইত্যাদি গ্রন্থে যুদ্ধের নীতিনিয়মই বর্ণিত হয়েছে। প্রথম কথা কোনো শক্তিশালীর সাথে কোন দুর্বলের যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। সমানে সমানে যুদ্ধ করার নির্দেশ ছিল। অস্ত্রপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হত। যেমন মহাভারতের অর্জুন এবং রামায়ণে লক্ষ্মণ যথাক্রমে পাশুপত অস্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেননি প্রবল প্রাণহানির আশঙ্কায়। যুদ্ধকালে ধর্মীয় স্থান, সাধারণ গৃহস্থদের বাসস্থান, [illegible] ও ধ্বংস করা নিষেধ ছিল, তাদের সম্পত্তি উপর আক্রমণ বা ধ্বংস করা যেত না, সেই দুর্বল মানুষ বা নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা বা আহতদের যুদ্ধ ছিল ধর্মযুদ্ধ যেখানে যুদ্ধবন্দী, অসুস্থ বা ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া হত। নারীবন্দীদের নীতিনিয়ম ব্যবস্থা অনুসরণ করা হত। এইসব যুদ্ধের মানবাধিকারের কথাই প্রত্যক্ষরূপে তৎকালীন সমাজের মানবাধিকারের কথা উল্লেখ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইতিহাস হল সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের ইতিহাস — আফ্রিকা থেকে এই ইতিহাস পৃথিবীর বিশাল সংখ্যক মানুষের দুর্দশার ইতিহাস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনত ক্রীতদাসত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আফ্রিকান আমেরিকানরা ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল এবং এই পর্যায়ে শ্রমিকেরাও চূড়ান্ত শোষণের সম্মুখীন হয়েছিল। আন্দোলনের 'মে দিবস' পালন এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ১৮৮৬ সালে শিকাগোতে ইলিনয়ে বহু মানুষ আন্দোলন করেছিলেন এবং প্রাণ দিয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এইসব ঘটনা সংঘটিত যুদ্ধ হয়েছিল গণহত্যা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যার ফলে মানবাধিকার বিশেষভাবে প্রবল আঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল। অবশ্য যদি বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের [illegible] সমাজতান্ত্রিক সংবিধানে রাজনৈতিক ও পৌর অধিকারের পাশাপাশি [illegible] অর্থনৈতিক মানবাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ও সামাজিক অধিকার স্বীকৃতি এবং সংস্থাগুলি

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুটি বিশ্বযুদ্ধে আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্বের অভিজ্ঞতায় নতুন পরিবর্তন হয়েছিল। এই দুটি যুদ্ধে যে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তা মানুষের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভয়ংকর দূষিত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সর্বপ্রথম রাসায়নিক বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে শত শত সৈনিককে হত্যা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমা বর্ষণ করেছিল। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে যুদ্ধ সবসময়ই মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করেছে। বিংশ শতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধ সেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations Organisation) গঠিত হয় বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে। ইতিমধ্যে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা বিভিন্নভাবে শিশু, নারী, প্রতিবন্ধী, উদ্বাস্তু, ক্রীতদাসত্ব, গণহত্যা প্রভৃতি এবং জাতিবিদ্বেষের ক্ষেত্রে কিছু অনুধাবন করার চেষ্টা করেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দুটি সংগঠন মানবাধিকারকে কার্যকর করার দায়িত্ব নিয়েছিল — মানবাধিকারের কমিশন এবং মানবাধিকারের কমিটি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত মানবাধিকারের কমিশনটি জেনেভায় অবস্থিত, এই কমিশন সারা পৃথিবীতে মানবাধিকারের সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে। এই কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ করা হয়, নিপীড়িত মানুষদের সাহায্য দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনমত সমস্যাপ্রবণ দেশগুলি পরিদর্শনের বন্দোবস্ত করা হয়। এছাড়া কয়েকশত আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (NGO) জাতিপুঞ্জের সঙ্গে পরামর্শ করার অধিকার লাভ করেছে।

মানবাধিকার রক্ষার উদ্যোগে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। এই প্রয়াসে দুটি উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে — একদিকে নারীকে বৈষম্য ও শোষণ থেকে রক্ষা করা এবং অন্যদিকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, উত্তরাধিকার সম্পত্তির মালিকানা ও ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা কর

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হল শিশুর অধিকার। সম্মিলিত শিশুর অধিকার-এর ঘোষণাপত্রে শিশুর অধিকারের এর সাথে বয়স্কদের দায়িত্ব উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মেই শিশু বয়স্কদের উপর নির্ভরশীল এবং তাছাড়া তাদের রাজনৈতিক অধিকার নেই। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য আলোচনা করার জন্য একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে একটি শিশুর সমর্থন রূপে

4th SEM

রাখা যে অধিকার আছে তার উপরে জোর দেওয়া হয়। Refugee-দের মানবাধিকার রক্ষার জন্য

একটি দিক হল বিভিন্ন উদ্বাস্তুদের অধিকার রক্ষা। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে উদ্বাস্তু বিশ্বযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। ১৯৫০ সাল থেকে বিভিন্ন সমস্যা নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সমস্যার সাথে মোকাবিলা করার দায়িত্ব নেয় United Nations High Commissioner for Refugees। এই সংস্থাটি ১৯৫৪ সালে ও ১৯৮০ সালে তার কাজকর্মের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে। বর্তমানে এই সংস্থাটির মূল কেন্দ্র হল এর প্রতিনিধিরা পৃথিবীর বহু দেশে কাজ করেন, ১৯৯৩ সালের জুন মাসে ভিয়েনাতে মানবাধিকারের উপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পৃথিবীর ১৬০টি রাষ্ট্রের ৫০০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে মানবাধিকারের সংরক্ষণের ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিগুলি সচেতন হয়। ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা বিশ্বের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আইনগত স্বীকৃতি পায়। ১৯৯৮ সালে যেমন কিছু রাষ্ট্রে এই ঘোষণাপত্রের সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হয়েছিল, প্রত্যেক বছর ১০ ডিসেম্বর তারিখে মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। ১৯৬৮ সালকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বর্তমানে মানবাধিকারকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন স্তরে উদ্যোগ নেওয়া হয়। জন বেইলিস (John Baylis) ও স্টিভ স্মিথ (Steve Smith) আন্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকারের সংরক্ষণের উদ্যোগকে তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন।

মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তৃতীয় বিশ্বে অঞ্চলগুলিতে দেশগুলি আঞ্চলিক সংগঠন ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছে যারা আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষা করার পাশাপাশি মানবাধিকার রক্ষার বিষয়েও সচেতন ভূমিকা পালন করছে। যেমন ASEAN (Association of South East Asian Nations), ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and Pacific) ইত্যাদি। তবে এই সংগঠনগুলি অধিকাংশই [illegible] নিয়ন্ত্রণের কার্য্য যেমনই কম করে। ASEAN যেমন মানবাধিকারের [illegible] ও মানবাধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে [illegible] চেষ্টা করছে তেমনি SAARC সন্ত্রাসবাদ ও মানবাধিকার ভঙ্গের [illegible] লড়াই করছে।

বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্র মানবাধিকার রক্ষায় উৎসাহ [illegible] মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে। ভারতের মতো অনেক রাষ্ট্রেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে পারে। একটি রাষ্ট্রের ভিতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের [illegible] পুলিশী অত্যাচার, বর্ণ বিদ্বেষ, স্বাধীন রাজনীতি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে [illegible] দাবী করতে পারে যে [illegible] আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের হস্তক্ষেপ

মানবাধিকার রক্ষার সঠিক দায়িত্ব নিবে,

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে মানবাধিকার রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এন.জি.ও (NGO) গুলি। এরা একটি শক্তিশালী সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি করে এবং একটি নৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে, এন.জি.ও গুলি আন্তর্জাতিক ও অঞ্চলগুলিতে এই দুই স্তরেই রাষ্ট্র যেখানে ব্যর্থ হচ্ছে সেখানে দায়িত্ব পালনের জন্য অগ্রসর হচ্ছে।

এই এন.জি.ও- গুলি প্রধানত চারটি ভূমিকা পালন করছে —

- তথ্য সংগ্রহ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলিতে প্রেরণ করছে। প্রত্যন্ত গ্রামের বহু মানবাধিকার ভঙ্গের খবর অন্যদের মারফত সরকারি সূত্রে পাওয়া সম্ভব নয়।
- আরো অনেক বেশি জনগণের অধিকারগুলিকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রগুলিকে সতর্ক করছে।
- সরকারি কাঠামো দুর্বল হলে মানবাধিকার রক্ষায় উদ্যোগী হচ্ছে।
- সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলছে।

বর্তমানে অনেকগুলো এন.জি.ও রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করছে, যেমন — Amnesty International, International Committee of the Red Cross, Human Rights Watch এবং International Committee of Jurists। এই সংগঠনগুলি বিশেষ বিষয়গুলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরে রাষ্ট্রগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে। বর্তমানে ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট পরিষেবা এই সংগঠনগুলিকে অনেক বেশি কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে।

এইভাবে বিবিধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানবাধিকারের সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়ে চলেছে। তবে মানুষকে তাদের সঠিক অধিকারকে পৌঁছে দিতে হলে অনেক বেশি সচেতনতা, সতর্ক ও নিষ্ঠার প্রয়োজন।

4th SEM

মানবাধিকারের স্বরূপ বা প্রকৃতি

ABK Page-1

মানবাধিকার ধারণাটির মূলে আছে প্রত্যেক মানুষকে যথার্থ মর্যাদা দানের অঙ্গীকার, এই ধারণা অনুসারী প্রত্যেক মানুষের অধিকার অন্তর্নিহিত, সর্বজনীন ও অবিচ্ছেদ্য।

মানবাধিকারের পূর্ণাঙ্গ ধারণার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অনিবার্যভাবে যুক্ত, এর কোনো একটিকে স্বীকৃতি না দিলে মানবাধিকার যথাযথ হয় না। মানবাধিকারকে কার্যকরী করার জন্য তিন ধরনের স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে বলে অনেকে মনে করেন। প্রথমত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ঘোষণার সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষের একটি যথাযথ ও সুন্দর জীবন গড়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাই চাকরি, অন্ন, গৃহ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষার অধিকার এই প্রসঙ্গে জরুরি। ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক সনদে এই বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, অধিকারকে যথাযথ করতে গেলে প্রত্যেক মানুষের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, বাস্তবে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই অধিকারগুলি কার্যকরী হয় সেই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির সক্রিয় কর্মী হিসেবে থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, ক্ষমতায়ন বিশেষত মহিলাদের ক্ষমতায়ন-এর বিষয়টির ইঙ্গিত থাকলেও তাকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দান করা হয় নি।

অনেক বিশেষজ্ঞ মানবাধিকারকে ইতিবাচক (Positive) ও নেতিবাচক (Negative) এই দুইভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী। যেমন সাম্যের অধিকার বা স্বাধীনতার অধিকার হল ইতিবাচক। আবার অত্যাচারিত না হওয়ার অধিকার বা বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হওয়ার অধিকার হল নেতিবাচক অধিকার।

মানবাধিকারের আর একটি বিভাজন হল প্রজন্ম ভিত্তিক বিভাজন (Generational classification of Human Rights)। পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারকে প্রথম প্রজন্ম অধিকার (First Generation Rights) বলা হয়। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের বল প্রয়োগ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার হল দ্বিতীয় প্রজন্ম অধিকার (Second Generation Right
যেগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের প্রতি তার দায়িত্ব পালন ক
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে সম্মিলি
জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়। ১৯৪৮ সালে এই জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভ
সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ
সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার ধারা ৩ থেকে ধারা ২১
~~অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার চিহ্নিত করা~~
~~ধারা 22 থেকে ধারা 27 পর্যন্ত~~ পৌর ও রাজনৈতিক অধিকা
য় বলা হয়েছে এবং ধারা 22 থেকে ধারা 27 পর্যন্ত অ

4th Gen

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের কথা চিহ্নিত করা হয়েছে। তৃতীয় প্রজন্ম অধিকার (Third Generation Rights)-এ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের বাইরে সমষ্টির (Collectivity)-র উপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of Self-determination), উন্নয়নের অধিকার (Right to Development), সুস্থ পরিবেশে বসবাসের অধিকার (Right to Healthy Environment) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রথম প্রজন্ম অধিকার স্বাধীনতা, দ্বিতীয় প্রজন্ম অধিকার সাম্য ও তৃতীয় প্রজন্ম অধিকার ভ্রাতৃত্বের ধারণাটিকে বিবৃত করে।

এই 'তিন প্রজন্ম অধিকার'-এর ধারণাটির জনক হলেন কারেল ভাসাক (Karel Vasak)। তাঁর রচিত একটি নিবন্ধ প্রকাশ হতে এই ধারণাটি আন্তর্জাতিক অভিধানে প্রবেশ করে, প্রথম প্রজন্ম অধিকার অর্থাৎ পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের ধারণা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রচলিত ফরাসি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণার মধ্যে চিহ্নিত আছে। দ্বিতীয় প্রজন্ম অধিকার অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সমাজবাদী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত এবং সমাজবাদী চিন্তাধারার আলোকে নতুন অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত মজুরি, সুন্দর জীবন, সামাজিক নিরাপত্তা, প্রয়োজন অনুসারে সমানভাবে খাদ্য বণ্টন ইত্যাদি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের বিষয়ে শুধু শিক্ষা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক অধিকারের অধিকারকেই অর্থাৎ অধিকার এবং সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের অধিকারকে স্থান দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় প্রজন্ম অধিকার তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক সংযোজন। ১৯৮৪ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক ঘোষিত জনগণের শান্তির অধিকার ~~(Declarat~~ এই প্রজন্মভুক্ত অধিকার। ভাসাকের মতে এই অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে আন্তর্জাতিক সমাজের সব ব্যক্তি, রাষ্ট্র, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সমাজ সামগ্রিকভাবে এই অধিকার ভোগ করতে পারে।

এই তিন প্রজন্ম অধিকার মিলে 'মানবাধিকার'-এর পূর্ণাঙ্গ কাঠামোটি নির্মিত হয়। তৃতীয় প্রজন্ম অধিকারগুলি যথাযথভাবে কার্যকরী হলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্ম অধিকারগুলিও অর্থপূর্ণ হয়।

১৯৪৮ সালে জাতিপুঞ্জের সাধারণসভায় সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই ঘো[ষণা] মানবাধিকারকে শুধু স্বীকৃতিই দেয় নি সেই সাথে এই বিষয়টির একটি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট তৈরী করে দিয়েছিল। প্রত্যেক মানুষ [illegible] আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য সেই দিকে আলোকপাত করা হয়ে[ছে]। এরপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে মানবাধিকার কমিশন গঠি[ত] [illegible] এই কমিশন রাষ্ট্রগুলিকে মানবাধিকার কার্যকর করার ব্যাপারে সচেত[ন] [illegible]

P